অডেন্‌স কল পেরিয়ে

- সুমন্ত রায়

এক বিকেলে অফিস থেকে ফিরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফেসবুকে চোখ রেখেছি, হঠাৎ এক ছবিতে চোখ আটকে যায়। ছবিটি শিবলিঙ পর্বতের। অসাধারন ছবি, তুলেছে অনুপম মন্ডল। ২০১৫ সেপ্টেম্বরে কালিন্দি খাল অভিযানের সময় নন্দনবন থেকে নেওয়া একটি শট। তখনই মনে হ'ল অনুপমের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। ব্যাস্, সে-রাতেই যোগাযোগ, পরের রবিবারে দেখা ও আলাপ। অনেক কথার পর ঠিক হ'ল আগামী বছর আমরা ট্রেকে যাবো একসাথে। রাস্তাটা লম্বা। গঙ্গোত্রী-মন্দির থেকে পায়ে হেঁটে 'অডেন্স-কল' অতিক্রম করে কেদারনাথের মন্দিরে পৌঁছে যাওয়া। এরপর আমরা বার বার মিটিংয়ে বসলাম, খুঁটিনাটি পরিকল্পনা হ'ল। অভিষেক-এর প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন এজেন্সির সাথে কথা শুরু করলাম। বেশির ভাগই উত্তরকাশির। শেষে মনোজ রাওয়াত (হিমালায়ান ট্রেক) এর সাথে কথা পাকাপাকি হ'ল। সে অভিষেক-এর পূর্ব পরিচিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে রাজি হ'ল।

দফায় দফায় কথা হল। আমাদের শর্ত অনুযায়ী অভিজ্ঞ প্রেম সিং-কে নিয়োগ করা হ'ল এ যাত্রার গাইড হিসেবে। অন্যান্য ব্যবস্থাও আমাদের পছন্দ মতই হ'ল। সব ঠিকঠাক হয়ে যেতে দুন এক্সপ্রেসে চেপে বসি, কলকাতা ছেড়ে যাই। তারিখটা, ০৩ সেপ্টেম্বর। কলকাতা থেকে আমরা তিনজন, প্রণবদা, অভিষেক ও আমি। আসানসোল থেকে উঠলো রাজুদা। হরিদ্বার থেকে যোগ দেবে অনুপম। পরদিন সকালে সবাই একসাথে। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে গল্প, কে কোথায় গিয়েছি এর আগে সেই সব অভিজ্ঞতার বিনিময়, ইত্যাদি। সবার সঙ্গে সবার বোঝাপড়া, ভাব-ভালোবাসা গড়ে ওঠে দ্রুত। দল হিসেবে আমরা প্রস্তুত।

পাঁচ তারিখ সকালে সবাই মিলে চড়ে বসলাম 'বিশ্বনাথ ট্রাভেল্‌স'র বাসে। দুপুর দুটোর মধ্যেই উত্তরকাশি। তারপর হোটেলে থিতু হয়ে আবশ্যিক কাজকর্ম সেরে একে একে বৈঠক শুরু করি মনোজ-জি ও প্রেমজি'র সাথে। শুনলাম, প্রেমজি দুদিন আগে 'অডেন্স-কল' ট্রেক শেষ করে ফিরেছেন। তার মানে, একেবারে টাটকা অভিজ্ঞতা। আমাদেরও প্রশ্ন অনেক। চলার পথ কেমন, কত দিন লাগতে পারে, দিন-প্রতি কত ঘণ্টা হাটতে হবে, ওয়েদার কেমন থাকবে, ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। তারপর রুটিনমাফিক পোর্টার নিয়োগ, দড়িদড়া, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম জোগাড় করা, জ্বালানীর ব্যবস্থা, পারমিট-এর কাগজ সংগ্রহ – সব কিছুরই দেখভাল করতে হ'ল।

পরদিন, অর্থাৎ ছ'তারিখেই আমরা রওনা দিলাম গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে। তখনও কাগজপত্র হাতে

পাইনি। ঠিক হয়েছে, প্রেমজি সেই কাগজপত্র সংগ্রহ করে, বাকি পোর্টার, দরকারি সরঞ্জাম, ইত্যাদি নিয়ে আসবে আমাদের পিছনে, সব ঠিক থাকলে পরের দিনই। এদিন গঙ্গোত্রী পৌঁছতে আমাদের বিকেল হয়ে গেল। তখন বেশ ঠাণ্ডা। মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা, তার কাছেই এক ছোট হোটেলে আমাদের রাতের আস্তানা। আমরা একটু আগেই ডিনার সেরে বিছানায় আশ্রয় নিই, গঙ্গার বিরামহীন কলতান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

সাত তারিখ সকালে রেকি'র উদ্দেশ্যে নদী পেরিয়ে সূরজ কুণ্ড'র পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করি। বেলা ১১-টা নাগাদ রুদ্রগয়রা নালা পার হয়ে একটা ছোট্টো পুলের ধারে বসে লাঞ্চ করি, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। একটানা নদীর গর্জন ও তার সাথে গাছের পাতার ঝিরিঝিরি আওয়াজ। বেশ সময় কাটে। চারটের মধ্যে আবার গঙ্গোত্রীর হোটেল। প্রেমজি আসবে যে। হ্যাঁ, একটু পরেই তিনি এলেন দলবল আর লটবহর নিয়ে। বেশ রাত পর্যন্ত বসে গল্প হয় মন্দির চাতালে বসে। চেনা কোলাহল থেকে কত দূরে এখানে এই মন্দিরের প্রার্থনাগীত ও ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে কেমন শান্ত হয়ে যায় মন।

'অডেন্স-কল' অতিক্রম করে কেদারনাথ যাওয়ার পথ আবিস্কার করেন জন বিকানিল অডেন ১৯৩৬-এ। তিনিই প্রথম এই পথ সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেন, ১৯৩৯-এ। অনেক পরে, ১৯৮০'র শেষ দিকে বিখ্যাত হরিশ কাপাডিয়া এবং রমেশ ভট্টাচার্য এই কল অতিক্রম করেন। পরবর্তীতে এই পথে অনেক সফল অভিযান হয়েছে। অডেন্স কল-এর উচ্চতা ১৮,১১৭ ফুট। গঙ্গোত্রী থেকে রুদ্রগয়রা (বা রুদগয়রা) গর্জ ধরে উঠে গেলে যোগীন ও গঙ্গোত্রী পর্বতের মাঝখানে যে গিরিপথ দেখা যায় সেটিই 'অডেন্স কল' নামে পরিচিত। এই কল পার হয়ে খাটলিং হিমবাহের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া যায় ভিলাঙ্গানা নদীর উৎসে। রুদগয়রা হিমবাহ থেকে আসা রুদ্রগঙ্গা নদী মিশেছে ভাগীরথীর সাথে, গঙ্গোত্রীর কাছে। আর খাটলিং হিমবাহ থেকে বেরিয়েছে ভিলাঙ্গনা। ভিলাঙ্গনা'র ডান তীরে খারশলি'র জঙ্গল অতিক্রম করে একে একে পৌঁছনো যায় এই পথের গাঙ্গি, রী, এবং ঘুট্টু গ্রামে। ঘুট্টু থেকে মোটরপথে ঘনশালি হয়ে নেমে আসা যায় টিহ্‌রি। আবার গঙ্গার সাথে দেখা হয়।

আট তারিখ সকাল। চারিদিক রোদ ঝলমল। গঙ্গা মন্দিরে সবাই মিলে পুজো দিয়ে যে যার স্যাক পিঠে তুলে নিই। সভ্য জগতকে পিছনে ফেলে যাত্রা শুরু করি রুদগয়রা গর্জের দিকে। পাহাড়ে প্রথম দিনের কষ্ট একটু বেশি। সূরজকুণ্ড আতিক্রম করে জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি সবাই। অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মাঝে পায়ের শব্দ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, আর নদীর কলতান – সব যেন একই সুরে বেজে চলেছে। রুদ্রগঙ্গা নদীকে ডানদিকে রেখে এগিয়েছে আমাদের রাস্তা। মাঝে মাঝে পাথরের উৎপাত আছে। তবে পাইন, দেওদার ও অন্যান্য গাছগাছালি সারা পথে ছায়া দেয়। রোদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পথ চলি। ঘণ্টাখানেক চলার পর বিরতি। অপেক্ষা করছে চড়াই। পাইনবন ভেদ করে পথ উঠে গাছে অনেক ওপরে। চড়াই ভেঙে কিছুটা উঠে গেলে আবার ঢেউখেলানো রাস্তা।

আরও কিছুটা ঝোপজঙ্গল পার হয়ে গতকালের জায়গাটা ছাড়িয়ে উঠি। সামনে পাহাড় ফুঁড়ে রুদ্রাগঙ্গা'র আত্মপ্রকাশ। সশব্দ প্রপাতে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গিরিখাতে। এক নড়বড়ে গাছের পুল পার হয়ে শুরু হল আবার চড়াই। এবার রুদ্রগঙ্গা-কে বাঁদিকে রেখে চড়াই ভাঙতে থাকি। মাঝে একটু থেমে জুস বিস্কুট খেয়ে নতুন করে চলা। এখানে জঙ্গল অনেক গভীর, গাছেরা আকাশ ছুঁয়েছে। একসময় জঙ্গল ছেড়ে বুক-উঁচু ঝোপের ভিতর দিয়ে প্রায় বিকেলের দিকে পৌঁছলাম নালা কাম্প (৩৭৬০-মি)। তাঁবু খাটানো হতেই হাতে হাতে চলে এলো গরম সুপ আর পপকর্‌ন। শরীর চাঙ্গা হ'ল। গরম জামা চাপিয়ে খুশমেজাজে আশপাশের ছবি তুলতে থাকি।

আজ তাঁবুতে প্রথম রাত্রিবাস। এদিক ওদিক থেকে কিছু আধপোড়া কাঠ জড়ো করে আনি। সন্ধে নামতেই তাঁবুর পাশে আগুন জ্বালানো হ'ল রান্না ও আগুণ পোহানোর জন্য। লেলিহান শিখা থেকে আগুনের ফুল্কি উড়ছে, ভেজাকাঠ জ্বলছে পট পট শব্দে, চলছে আগুন পোহানো, রাতের রান্নাও। আজ তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ করে গরম কমপ্লান খেয়ে শুয়ে পড়ি। সারাদিনের ক্লান্তি, ঘুম আসতে দেরি হয় না।

০৯ সেপ্টেম্বর। সকাল সাড়ে-ছটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁবুর ঠিক পিছনে খাড়া চড়াই ধরে উঠতে হবে। ভোরের অসাড়তা কাটতে সময় লাগে, চলতে চলতে গতি আসে। প্রায় দেড়-ঘণ্টা চড়াই ভাঙার পর একটা প্রায় সমতল জায়গায় এসে পৌঁছলাম। গাছপালা নেই, ঘাসজমি আর ছোট ছোট লালচে রঙের ঝোপ। দুরে দূরে সবুজের ছোঁয়া। আরও কিছুটা এগিয়ে

জুটলো একটা ভেড়াওয়ালাদের ছাউনি। ভেতরে নরম লোমের চাদর বিছানো, ওরাই বাইরে বসে ভেড়ার লোম ছাড়াচ্ছে। ছারিদিকে অজস্র ভেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ভেড়াওয়ালারা ঘর গ্রাম ছেড়ে দূরের পাহাড়ি চারণভূমিতে ডেরা বাঁধে কয়েক মাসের জন্য। বিচিত্র ওদের জীবনযাত্রা। আমরা ওদের কাছেই বিশ্রাম নিই, ওদের দেওয়া দুধ পান করি।

রুদ্র গয়রা পিক

বিশ্রামের পর আবার চলা। বিশাল সমতল এলাকাটা পেরিয়ে নেমে এলাম এক নালার কাছে, হাত ধরাধরি করে সেটি পার করতেই শুরু হয় চড়াই। ঘাসের ঢালে প্রায় ৬০ ডিগ্রি কোণে উঠেছে পথ। আজকের শেষ চড়াই। ঘণ্টা দুই উঠে থেমে, আবার উঠে একসময় দেখতে পেলাম ক্যাম্পসাইট। একটা সমতল জায়গা, পাশে পাথরের স্তূপ। বুঝলাম, সামনে রুদগয়রা বেসক্যাম্প।

এখানে রান্নার জায়গা করা আছে। আগের কোনও দল করেছিল। ওখানেই রান্না শুরু হল। কুক এসে মুড়ি-চানাচুর দিয়ে গেল। রোদ ঝলমলে আকাশের নীচে ম্যাট্রেস পেতে মুড়িমাখা খেতে খেতে আমাদের গল্প শুরু হয়। কিন্তু গল্প দ্রুত থেমে যায়। দৃশ্য চোখ টেনে নেয়। সামনে ঝকঝক করছে পর্বতের চূড়াগুলো। চা পানের পর সবাই জ্যাকেট চাপিয়ে নিলাম। কেননা জোর হাওয়া বইছে। রোদ পড়ে আসার সাথে ঠাণ্ডা বাড়ে পাল্লা দিয়ে। একসময় যে যার তাঁবুতে আশ্রয় নিই। বিকেলে আকাশ মেঘলা থাকলেও রাতের দিকে আকাশ পরিষ্কার। এক দিকে যোগীন গ্রুপ, আর এক দিকে রুদগয়রা পিক, একটু দূরে গঙ্গোত্রী গ্রুপ অফ পিক্স সার দিয়ে দাঁড়িয়ে।

১০ সেপ্টেম্বর। ভোরের আলো ফুটতেই বাইরে বেরিয়ে আসি। পূবের আকাশ আলোয় ভাসছে। অসাধারন মায়াবী পরিবেশ। আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পিছনে ধর্মা-জি'র গলা, 'গুডমর্নিং স্যারজি।' আমাদের ওঠার আগেই শুরু হয়ে গেছে ওদের প্রস্তুতি। গঙ্গোত্রী গ্রুপের মাথায় তখন সোনার মুকুট লেগেছে। অনুপম, অভিষেক বেরিয়ে পড়েছে ক্যামেরা নিয়ে। ছবি তোলার পর্ব চলছে। পর্বতের ঘেরা পার করে ক্যাম্পসাইটে রোদ আসতে বেশ দেরি হয়। এর মধ্যে আমাদের প্রস্তুতি সারা হয়েছে। শুরু হল দিনের পথ চলা। প্রায় সমতল থেকে কিছুটা নিচে নেমে দাঁড়াই। আমাদের

চলার অভিমুখ পশ্চিম দিকে। সামনে গঙ্গোত্রী-১ (২১,৮৯০), গঙ্গোত্রী-২ (২১,৬২৬) গঙ্গোত্রী-৩ সবটা দেখা যাছে না। পশ্চিম দিকে গঙ্গোত্রী-১ থেকে একটি গিরিশিরা এসে মিশেছে রুদ্গয়রা'র কাঁধে। সামনে অনেকটা জুড়ে আছে এই রুদগয়রা (১৯,৯০১)। ওদিকে যোগীন-১ থেকে একটি গিরিশিরা এসে মিলছে গঙ্গোত্রী-৩ এর কাঁধে। এই সংযোজক শিরার মাঝখানেই আছে অডেন্স কল। যোগীন গ্রুপ থেকে নেমে এসেছে একটি লম্বা হিমবাহ। সেই হিমবাহকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে আমাদের চলতে হবে পরবর্তী ক্যাম্পের দিকে।

সুখা তাল এ ক্যাম্পিং গ্রউন্ড

পাথরবোঝাই পথ, যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হিমবাহের উপর নেমে চোখে পড়ছে পান্না সবুজ ছোট ছোট জলাশয়। ছাইরঙা হিমবাহে অসংখ্য ক্রিভাস। তার মধ্য দিয়ে চলছে তেজি চড়াই আর উৎরাই। খুব সাবধানী পায়ে ঝুরো ও বড় পাথরের সাম্রাজ্য পার হয়ে যাই। এখানে সামান্য ভুলও মার্জনীয়। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর উঠে এলাম বিরাট এক সমতল ক্ষেত্রে। এটি আসলে শুকিয়ে যাওয়া হ্রদ। জায়গার নাম সুখা তাল। জল নেই, শুধু মাঝে এক জায়গা দিয়ে সরু এক ধারা নেমে এসেছে। বুঝলাম, আজকের রাত্রিবাস এখানেই হবে।

পৌঁছেছি দুপুরে। তখনই আকাশ মেঘলা। পরে শুরু হয়েছে হালকা তুষারপাত। সবাই গিয়ে কিচেন টেন্টে ঢুকেছি। চিকেন-সুপ সহযোগে শুরু হ'ল পরবর্তী পথের আলোচনা। আজ কারও কারও অলটিচ্যুড সিক্‌নেস (উচ্চতা-জনিত সমস্যা) শুরু হয়েছে। আলোচনা করে ঠিক হল আগামীকাল আমরা এখানেই বিশ্রাম করব। আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হল, প্রেমজি, অভিষেক ও আমি সামনে কিছুটা হেঁটে এলাম। বিকেলের দিকে বেশ হাওয়া দিতে শুরু করল, বাইরে থাকা যাছে না। তাঁবুর ভিতরে জড়ো হই। গল্পে গল্পে রাত বাড়ে। ওদিকে ধর্মা রাতের খাওয়ার জন্য হাঁকডাক শুরু করেছে। গরম গরম খিছুড়ি, পাপড়ভাজা আর সয়াবিনের তরকারি। লোভ সামলানো যায় না।

সকালে প্রেমজি'র ডাকে ঘুম ভাঙে। তাঁবুর চেন খুলতেই ধুমায়িত চায়ের কাপ। আজ সব পরিস্কার। ব্রেকফাস্ট করে সদলে বেরিয়ে পড়ি অডেন্স-কল বেস-ক্যাম্পের দিকে। উদ্দেশ্য রেকি। সঙ্গে

জলের বোতল, বিস্কুট, কামেরা। বেশ কিছুটা পথ রিজ ধরে হেঁটে বেসকাম্প। আমাদের সামনে অডেন্স কল।পূবেযোগিন গ্রুপ, পশ্চিমে গঙ্গোত্রী গ্রুপ। বেলা বাড়ার সাথে বাড়ে হাওয়ার দাপট। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘে চারিদিক ঢেকে যায়। দেরি না করে ফেরার পথ ধরি আমরা। প্রনবদা সুস্থ নয়, কাল থেকে ভুগছে। সবদিক ভেবে স্থির হয়, আগামীকাল সে নীচে নেমে যাবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠেছে সবাই। আগে প্রনবদার সঙ্গে লোক ও রসদ দিয়ে নীচে পাঠান হ'ল। সেই হরিদ্বারে গিয়ে প্রনবদার সঙ্গে দেখা হবে আবার। প্রনবদাকে বিদায় জানিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়ি। চেনা রাস্তা ধরে আবার বেসক্যাম্প-এর দিকে এগিয়ে যাই। রাস্তা বেশি নয়, তাই ঠিক হল বেসক্যাম্প-এ না থেমে আমরা অ্যাডভান্স বেসক্যাম্প পর্যন্ত চলে যাবো আজ। সেইমতো বেসক্যাম্প পেরিয়ে আমরা উঠে আসি মূল হিমবাহের উপর। চারিদিকে শুধু বরফ আর পাথর। বিস্তীর্ণ হিমবাহ অতিক্রম করে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলধারা হাত ধরাধরি করে পার হয়ে আবার বরফ এর উপর দিয়ে এগিয়ে যাই ধীরে, সাবধানে। গাইড ও পোর্টারদের ক'জন আগে রাস্তা করে যাচ্ছে, ওদের পায়ের ছাপ দেখে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

দুপুরের দিকে একটা পাথরের অসম চাট্টানে এসে দাঁড়ালাম। প্রেমজি জানিয়ে দিল, এই আমাদের অ্যাডভান্স বেস-ক্যাম্প। প্রচন্ড হাওয়ার মধ্যে তাঁবু খাটানো হ'ল। অডেন্স-কল অতিক্রমের আগে রুদ্রগয়রা ভ্যালিতে এটি আমাদের শেষ শিবির। বিকেলের দিকে হাওয়া কমলে সবাই বাইরে এলাম। কাল সকালে আমাদের যাত্রা শুরু বহু প্রতীক্ষিত অডেন্স-কলের উদ্দেশে। রাতে খাওয়ার পর আবার বাইরে এসে দাঁড়াই। চাঁদের আলোয় ভাসছে চারিদিক। ধর্মা এসে কফির মগ তুলে দেয় হাতে। এদিকে ঠান্ডা বাড়ছে ক্রমশ। কফি খেয়েই ঢুকে পড়ি স্লিপিং-বাগে।

ভোর ১৩ সেপ্টেম্বর, অডেন্স-কল এর পথে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়েছি। সবার আগে প্রেম, পিছনে বাকি সবাই সার দিয়ে। বরফের ঢালে হাঁটুভাঙা চড়াই। খুব ধীরে উঠছি, তবু বেশ বেদম লাগছে। খানিকটা উঠছি আর

থামছি। অনেকটা উঠে যাওয়ার পর ক্রিভাসের দেখা মিলতে থাকে, একের পর এক। আমরা পাহাড়ের ডানদিকের ঢালে চলে এসেছি। নীচ থেকে যতটা কাছে মনে হচ্ছিলো কল, সময়ের সাথে সাথে সে যেন ততটাই দূরে সরে যাচ্ছে। এইমাত্র যোগিনের মাথায় আলো লেগেছে। একটু আলো পড়েছে কল-এর ওপর। এক'পা দু'পা করে আরও খানিক এগোতেই পথ আগলে দাঁড়াল দানবীয় এক ক্রিভাস। প্রেমজি বরফের ঢালে রোপ ফিক্স করে। একঘণ্টার চেষ্টায় গোটা দল জায়গাটা পেরিয়ে উঠি। আকাশে হালকা মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে, পাহাড়ের ঢাল ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আমরা অতি সন্তর্পনে হাঁ করে গিলতে আসা ক্রিভাসগুলোকে নেগোশিয়েট করে উঠতে থাকি। বরফ ছেড়ে এবার চলা শুরু হল পাথর-বরফে মেশানো ঢাল ধরে। খুব ধীরগতির যুদ্ধ চলছে যেন, কিন্তু উত্তেজনায় ঘাটতি নেই এতটুকু।

লম্বা যুদ্ধের পর আমরা এসে পৌঁছলাম অডেন্স-কল এর শিরে। সবাই আনন্দে আত্মহারা। ওপরে নীল আকাশের গ্যালারিতে তুলোটে মেঘেরা দর্শক, তারাই যেন হাততালি দিচ্ছে। আর ভাসমান রেশমি মেঘগুলো বিজয় পতাকার মতো অভিনন্দন জানাচ্ছে। প্রনবদার কথা খুব মনে পড়ছে। একটা কাডবেরি দিয়ে রেখেছিল আমাদের কাছে, তাই দিয়ে পুজো দেওয়া হ'ল। কামেরাবন্দি করে রাখি সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বেশ কিছুটা সময় অডেন্স শীর্ষে কাটিয়ে এবার নীচে নামার পালা। ওঠার থেকে নামার ঝক্কি অনেক বেশী। পা হড়কে যায় যখন তখন। এক পোর্টার পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনওমতে সামলে নিলেও পিঠের সব জিনিষ পড়ে গেল একটা ক্রিভাসে। অনেক কসরতের পরে উদ্ধার হয় স্টোভ, কেরোসিনের ক্যান, এটা ওটা। আরও কিছু চোরা ক্রিভাস টপকে এসে দাঁড়াই ফাতিং হিমবাহের উপর। অডেন্স কল অতিক্রম হল অবশেষে। এবার এগিয়ে চলা ফাতিং হিমবাহের বাঁদিক ধরে। গোটা পথে ক্রিভাসের মেলা বসেছে। মাকড়শার জালের মতো ফাঁদ পাতা রয়েছে যেন। ফলে রাস্তা সরলরেখায় যায় না কিছুতেই।

দুপুর দুটো নাগাদ তাঁবু পাতা হল হিমবাহের বাঁদিকের মোরেন শেলফে। বড় অপরিসর জায়গা। তাঁবু দাঁড়িয়ে গেলে হাতে আসে গরম সুপ, ক্লান্তি কাটে। আবহাওয়া আবার খারাপ হতে শুরু

করেছে। তাঁবুর ভিতরে বসে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। রাতের দিকে শুরু হল বরফপতন, সবাই রাত জেগে টেন্ট ঝাড়তে থাকি। এমনি করেই সকাল হয়। তখনও বরফপাত চলছে। বরফ পড়া না থামলে বেরোনোও যাবে না। সবাই ব্রেকফাস্ট করে অপেক্ষা করি। দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়ে না।

আটটা নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করে। আধঘণ্টার মধ্যে সব একেবারে ঝকঝকে, পরিষ্কার। নতুন বরফে চারিদিকে ধবধবে সাদা, তার মধ্যে আমাদের রঙবেরঙের তাঁবুগুলো দেখে মনে হচ্ছে ক্যানভাসে আঁকা ছবি। দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। এত বরফের মধ্য দিয়ে চলায় অগ্রগতি কম হয়। আজকের গন্তব্য খাটলিং গ্লেসিয়ারের স্নাউট, বা জিরো পয়েন্ট। নতুন বরফে ছোটখাট ক্রিভাসগুলো ঢেকে গেছে, প্রতি পা দেখেশুনে ফেলতে হচ্ছে। পথ চলছে সাপের মত এঁকে বেঁকে, বিশাল বরফের চাঁইগুলোকে পাশ কাটিয়ে। তাতেও যে পতন আটকানো গেল এমন নয়। চোরা ক্রিভাসে দুয়েকজন এক বুক ঢুকে গেল, আবার ধরাধরি করে তাদের তোলাও হ'ল। তারপর একসময় বরফের রাজত্ব শেষ হয়, পাথরের রাজত্ব শুরু হয়।

এখন পরিস্থিতি আরও বিপদজনক। উপরে বোল্ডার, নীচে গ্লেসিয়ারের শক্ত জমাট বরফ। বারবার পা পিছলে যায়। প্রাকৃতিক কারনে ল্যাটারাল মোরেনের রাস্তাটা নেই, তাই গ্লেসিয়ারের মাঝখান দিয়ে নামছি আমরা। আরও

কয়েক ঘণ্টা এভাবে চলার পর আমরা খাটলিং স্নাউটে এসে পৌঁছলাম। সমতল জায়গা, অনেকদিন পর আবার সবুজের দেখা। ছোট একটা নদী চলে গেছে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে। বিকেলের সোনালী রোদে নদীর জল চিক চিক করছে। আমরা আসলে ভিলাঙ্গনা নদীর চরে তাঁবু পেতেছি। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবল, দিন শেষ হয়ে রাত্রি এল। সে এক মায়াময় রাত্রি। কালচে নীল রাতের আকাশে অগুনতি তারার নীচে আমরা কজন মানুষ সাক্ষী রইলাম। জোৎস্নার চাদর মুড়ে ঘুমিয়ে আছে পাহাড়, দূরের বরফচুড়া যত। চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। বাইরে আগুন জ্বালিয়ে রাতের রুটি, সবজি তৈরি হচ্ছে। আমরা তাঁবুর মধ্যে বসে নদীর গানে কান পেতে রেখেছি।

১৫ সেপ্টেম্বর। সকালেই আমি দলছাড়া হয়ে যাই। স্থির করেছি, আমি একজন পোর্টার নিয়ে ভিলাঙ্গনার সঙ্গে গাঙ্গি গ্রামের দিকে নেমে যাবো। বাকিরা উলটোদিকের পর্বতপ্রাচীরে অবস্থিত মাওয়ালি পাস পেরিয়ে যাবে কেদারনাথের উদ্দেশে। পরিকল্পনা এরকমই ছিল, তবু সবারই একটু মন খারাপ। প্রেমজি আমার সবকিছু গুছিয়ে দিল। একসাথে ব্রেকফস্ট সেরে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নামতে থাকি নদীর সাথে। ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড পিছনে পড়ে রইলো।

বেশ কয়েকঘণ্টা হেঁটে ফেলেছি। সামনে একমানুষ সমান ঝোপ জঙ্গল, তারই মধ্যে পায়ে চলার রাস্তাটা খুঁজে পাই। সারা দিন মনের আনন্দে হেঁটেছি, একসময় জঙ্গলের পথে আলো কমে এলো। ঝিঁঝিঁ'র টানা আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বার বার মনে হচ্ছে, এই বাঁকটা পার হলেই গ্রামের দেখা পাবো। সব মনে হওয়া নস্যাৎ করে দেখা যায় আর একটা বাঁক। যেতে যেতে ঝুপ করে সন্ধে নামে পাহাড়ের গায়ে। নদীর ধারে একটা সমতল জায়গা দেখে রাতের তাঁবু ফেলা হ'ল। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কাঠকুটো জোগাড় করে আগুণ জ্বালানো হয়। নদীর জল গরম করে ম্যাগির ব্যবস্থাও হয়। তারপর নিশ্চিন্তে স্লিপিং-ব্যাগের আশ্রয়ে।

১৬ সেপ্টেম্বর। সকালে একটু ভারি ব্রেকফাস্ট সেরে আবার বেরিয়ে পড়ি। আজও সারদিন হাঁটার মতলব রয়েছে। নদীর অনুকূলে মোটামুটি উৎরাই পথ। ঘণ্টা পাঁচেক চলার পর নজরে এলো চাষের খেত, আরও এগিয়ে দেখতে পাই ঘরবাড়ি। বেশি নয়, পনেরো বিশটা বাড়ি। এখানে পৌঁছে শত হাঁকডাক করেও কারো সাড়া পাই না। অগত্যা চলতে থাকি। দুপুর দুটো নাগাদ পৌঁছলাম গাঙ্গি গ্রামে। এ রাস্তায় আগেও এসেছি, তাই চিনতে অসুবিধে হ'ল না। দোকানপাট খোলা নেই দেখে এক বাড়িতে গিয়ে অতিথি হই। বাড়ির মহিলারা ডাল-রুটি খেতে দিলো। এখানেই একটু বিশ্রাম নিয়ে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে আবার হাঁটা দিই। নদীর সঙ্গে সুখের পথ চলা। চলতে চলতে বিকেল হয়। কিন্তু সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছে যাই রী গ্রামে। তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

অনেক এদিকওদিক করে গ্রামের চৌকিদারের দেখা পাই। দরবার করে ওনার বাড়িতেই রাতের আশ্রয় জুটিয়ে নিই। আসলে রী গ্রামের লোকজন আজ সদলে চলে গেছে গাঙ্গিতে। ওখানে

বড় এক পুজো আছে। বাইরে বৃষ্টি, ঠাণ্ডাও পড়েছে জাঁকিয়ে। স্লেট পাথরের চালে ভারি বর্ষণের আওয়াজ। উনুনের পাশে বসে জোর গল্প চলছে চৌকিদার ও তার তিন বউয়ের সাথে। হাতে গরম চায়ের মগ। কোথা দিয়ে দুটি ঘণ্টা কেটে যায়। এর মধ্যে রান্না হয়েছে সুখা মাংসের ঝোল আর ভাত। অনেকদিন পর প্রানভরে খাওয়া হ'ল। তারপর মাটির বাড়ির ছোট ঘরে ভেড়ার লোমের নরম বিছানায় শুয়ে পড়ি পরম নিশ্চিন্তে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, ঘরে আলোর বান ডেকেছে। চোখ তুলে চাই। মাথার উপরে ছোট্ট জানালাপথে এসেছে চাঁদ! জানালায় গিয়ে দাঁড়াই। গ্রাম, নদী, পাহাড় এক জলছবিতে ভাসছে!

১৭ সেপ্টেম্বর। সকাল সকাল চৌকিদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিই ঘুট্টুর দিকে। দশটার মধ্যে পৌঁছে যাই গন্তব্যে। এক কাপ করে চা খেয়ে দুজনে চেপে বসি শেয়ার জিপে। জিপ ছুটল ভিলাঙ্গনার সাথে মোটরপথ ধরে। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাই ঘনশালি বাসস্ট্যান্ডে। এক জায়গায় লাঞ্চ সেরে এ কদিনের সঙ্গী জগ্‌গা-কে বিদায় জানাই। আমি নিজে উঠে বসি হরিদ্বারের বাসে।

১৯ সেপ্টেম্বর। গতকাল ওরাও নেমে এসেছে হরিদ্বারে। অনুপম, অভিষেক, রাজুদা মাওয়ালি অতিক্রম করে কেদারনাথ দর্শন সেরে ফিরেছে। প্রণবদা তো আগে থেকেই অপেক্ষা করছে এখানে, পুরনো মিশ্রভবনে। দিন ক্ষণ মেনে সবই সারা হয়েছে। আজ সবাই মিলে গঙ্গার ধারে সন্ধ্যারতি দেখি। তারপর মিশ্রভবনের ঘর ছেড়ে তল্পিতল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দুন এক্সপ্রেস অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে ঘরের লোকজন, আমাদের দৈণন্দিন জীবন।